পুঁজির বিশ্বযাত্রা

আনু মুহাম্মদ

'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে'র নামে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী আগ্রাসন চলছে বছর বছর। বিশ্বের সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর নেতা, বাকিরা তার সহযোগী। এই মডেল প্রায় সব দেশের শাসকদের জন্য নিপীড়নমূলক আইন ও সন্ত্রাসী ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য খুবই সুবিধাজনক অছিলা হয়েছে। 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে'র ছাতার নীচে সবধরনের সন্ত্রাসী বর্ণবাদী জাতিবিদ্বেষীদের ঠাঁই হয়েছে, তাদের চাষ হচ্ছে। বিশ্বায়নের কল্যাণে সকল সন্ত্রাসী বর্ণবাদীরা এখন আন্তর্জাতিক ভাবে সংঘবদ্ধ। রাষ্ট্র/গোয়েন্দা সংস্থার আশির্বাদ যারা পাচ্ছে তাদের আরও বেশি জয়জয়কার– তা হোক শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান বর্ণবাদী, বা হোক ইহুদীবাদী, হোক হিন্দুত্ববাদী, হোক বর্মী জাতীয়তাবাদী, হোক তালেবান বা আইসিস। বর্তমান বিশ্ব তাই জাতিগত, ধর্মীয় ও বর্ণবাদী সংঘাত, ঘৃণা ও বিদ্বেষে ক্রমেই আরও বেশি জর্জরিত। জগত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না দেখলেও এসব ঘিরে যুদ্ধ, সন্ত্রাস আর চরমপন্থার বিস্তার দেখছে। বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের জয়যাত্রা নিরঙ্কুশ হবার কালে এই হল চিত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধে পুঁজিবাদের সূচনাকাল, পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক সূত্রায়ন এবং এই বিশ্বব্যবস্থার গতিমুখ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পুঁজিবাদের সূচনা : নিজের আদলে বিশ্ব

'...এটি সকল জাতিকে উচ্ছেদের বেদনা নিয়ে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে; এটা বাধ্য করে যাকে তারা সভ্যতা বলে তা গ্রহণ করতে, তাদের বুর্জোয়ায় পরিণত হতে। এক কথায় তা নিজের আদলে বিশ্বকে নির্মাণ করে।' (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস)

১৮৪৭ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনে কমিউনিস্ট লীগ নামে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক একটি সংগঠনের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। গোপনে করতে হয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস পার্টির জন্য একটি সামগ্রিক ঘোষণাপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কস ও এঙ্গেলস এর জার্মান ভাষায় লেখা কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে তাঁরা পুঁজিবাদের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুক্তির সংগ্রামের নিশানা হাজির করেন। এতে পুঁজিবাদের শক্তি ও তার দুর্দমনীয় যাত্রা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন, 'উৎপাদনের উপায়, এবং সেকারণে উৎপাদন সম্পর্কের, সেই সাথে সমাজের সকল সম্পর্কের অবিরাম বিপ্লবীকরণ ছাড়া বুর্জোয়ারা টিকতে পারে না। ...উৎপাদনের অবিরাম বিপ্লবীকরণ, সকল সামাজিক শর্তের অব্যাহত ভাঙন, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও তোলপাড় বুর্জোয়া পর্বকে আগের সব পর্ব থেকে আলাদা করেছে। সকল স্থির, জমাট বাঁধা সম্পর্ক তাদের সকল প্রাচীন ও পরম পূজনীয় সংস্কার ও বিশ্বাস উড়ে যাচ্ছে, সব নতুনগুলোও সেকেলে হয়ে যাচ্ছে।' এতে আরও বলা হয়, 'নিজেদের পণ্যের বাজারের অবিরাম সম্প্রসারণের চাহিদা বুর্জোয়াদের বিশ্বের সর্বত্র তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে সর্বত্রই আশ্রয় খুঁজতে হবে, সর্বত্র বসতি গাড়তে হবে, সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। ...এটি সকল জাতিকে উচ্ছেদের বেদনা নিয়ে বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে; এটা বাধ্য করে যাকে তারা সভ্যতা বলে তা গ্রহণ করতে, তাদের বুর্জোয়ায় পরিণত হতে। এক কথায় তা নিজের আদলে বিশ্বকে নির্মাণ করে।' (মার্কস ও এঙ্গেলস, ১৯৭৭; ৩৬-৩৮)

গোড়ার দিকে পুঁজিবাদের অন্তর্গত প্রবণতা কীভাবে তাকে বৈশ্বিক ব্যবস্থায় পরিণত করতে যাচ্ছে মার্কস তার রূপরেখা এভাবেই হাজির করেছিলেন। এরপর পুঁজির গঠন, একচেটিয়াকরণ, অগ্রাধিকার, বহুজাতিক সংস্থার বৈশ্বিক বিস্তার ইত্যাদি ব্যাপকতা লাভ করেছে। ১৯৯০ নাগাদ কয়েকটি দেশ বাদে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর আক্ষরিক অর্থেই পুঁজিবাদ একটি একক বিশ্বব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

কয়েক শতক জুড়ে ভয়াবহ দাস বাণিজ্য চললেও, উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত, আফ্রিকার উপকূল থেকে ভেতরে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক বিস্তার ঘটাতে পারেনি। কিন্তু বিশ শতকের শুরু নাগাদ দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তন ঘটে। বর্বর হত্যাযজ্ঞ ও আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে আফ্রিকার বেশিরভাগ অঞ্চল ইউরোপীয় পুঁজির করতলগত হয়। প্রায় ১ কোটি বর্গমাইল বা আফ্রিকার শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী দখল করে নেয়। এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ফ্রান্স, শতকরা ৩০ ভাগ ইংল্যান্ড, বাকি ২৩ ভাগ জার্মান, বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও স্পেন দখল করে।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটেন দখল করে ৪৫ লাখ বর্গমাইল, ফ্রান্স ৩৫ লক্ষ, জার্মানি ১০ লক্ষ, বেলজিয়াম ১ লক্ষ, রাশিয়া ৫ লক্ষ, ইটালি ১ লক্ষ ৮৫ হাজার, যুক্তরাষ্ট্র ১লক্ষ ২৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা প্রত্যক্ষ উপনিবেশে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ বৃটেনসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তি পুরো ভারতবর্ষ ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও আধিপত্য নিশ্চিত করে। ১৯০৭ সালে পারস্য ভাগ করে নেয় রাশিয়া ও বৃটেন। ১৮৮৭ সালের মধ্যে পুরো ইন্দোচীন ফ্রান্সের করতলগত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিত্ব বিস্তৃত হয় সামোয়া, হাওয়াই, পুয়ের্টোরিকো, ফিলিপাইন, কিউবা, ডমিনিক্যান রিপাবলিক, হাইতি, নিকারাগুয়া এবং পানামায়। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটেন দখল করে ৪৫ লাখ বর্গমাইল, ফ্রান্স ৩৫ লক্ষ, জার্মানি ১০ লক্ষ, বেলজিয়াম ১ লক্ষ, রাশিয়া ৫ লক্ষ, ইটালি ১ লক্ষ ৮৫ হাজার, যুক্তরাষ্ট্র ১লক্ষ ২৫ হাজার বর্গমাইল এলাকা প্রত্যক্ষ উপনিবেশে পরিণত হয়। (হান্ট, ১৯৭৯; ৩২৮-২৯) ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পেছনে যুক্তি ছিল বর্বরদের কাছে সভ্যতা ও খ্রিস্টিয়ানিটির আহ্বান পৌঁছানো।

সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব

'অগ্রসর দেশগুলোতে বিপুলাকার 'পুঁজির উদ্বৃত্ত' সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এই উদ্বৃত্ত পুঁজি নিজ দেশের অনগ্রসর অঞ্চলকে উন্নত করা বা ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহৃত হবার বদলে এর

মুনাফার আশায় রফতানি করা হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোতে।' –ভ. ই. লেনিন

পুঁজির আদি সংবর্ধনের বৈশিষ্টসমূহ–যুদ্ধ, ধ্বংস, দখল, জালিয়াতি, প্রতারণাসহ বলপ্রয়োগের নানা মাধ্যম পুঁজিবাদী সংবর্ধনের এক স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেজন্য যুদ্ধবাদ পুঁজিবাদের চিরসঙ্গী। –রোজা লুক্সেমবুর্গ

উনিশ শতকের শেষ থেকেই পুঁজিবাদের একচেটিয়াকরণ এবং বৈশ্বিক সম্প্রসারণ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার তাগিদ তৈরি হয়। এই পর্বকে 'সাম্রাজ্যবাদ' আখ্যায়িত করে সে সম্পর্কে প্রথম তাত্ত্বিক সূত্রায়ন করেন জে এ হবসন। তাঁর গ্রন্থ *ইম্পেরিয়ালিজম: এ স্টাডি* প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। হবসন তাঁর অনুসন্ধানে দেখেন ব্যাংকার এবং অর্থলগ্নীকারকরাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে। কারণ সাধারণ বাণিজ্যের তুলনায় ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের মধ্যে দিয়ে বাণিজ্যের মুনাফা অনেক বেশি। খ্রিষ্টিয়ান মিশনারী, উদ্ধত রাজনীতিবিদ, আগ্রাসী সামরিক জেনারেলেরা তাদের সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে। (হান্ট, ১৯৭৯; ৩৩০-৩৩৫) ১৯১০ সালে অস্ট্রিয়ান তাত্ত্বিক রুডলফ হিলফারডিং *ফিন্যান্স ক্যাপিটাল* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানেও পুঁজির একচেটিয়াকরণের উৎস সন্ধান করা হয়।

রোজা লুক্সেমবুর্গ পুঁজিবাদের আগ্রাসী বিস্তার নিয়ে শক্তিশালী বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন তাঁর *একুমুলেশন অব ক্যাপিটাল* গ্রন্থে, ১৯১৩ সালে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব *একুমুলেশন অব ক্যাপিটাল: এ্যান এন্টি ক্রিটিক* প্রকাশিত হয় এর কয়েক বছরের মধ্যে। রোজার মূল সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, পুঁজিবাদের অস্তিত্বের জন্যই বিভিন্ন দেশে তার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অপরিহার্য হয়ে উঠে। মার্কস যেখানে পুঁজির আদি সংবর্ধনকে দেখেছিলেন পুঁজিবাদের সূচনাকালের একটি পর্ব হিসেবে, রোজা মার্কর্সের বিশ্লেষণ সম্প্রসারণ করে দেখেছিলেন যে, পুঁজির আদি সংবর্ধনের বৈশিষ্টসমূহ– যুদ্ধ, ধ্বংস, দখল, জালিয়াতি, প্রতারণাসহ বলপ্রয়োগের নানা মাধ্যম পুঁজিবাদী সংবর্ধনের এক স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেজন্য যুদ্ধবাদ পুঁজিবাদের চিরসঙ্গী। (লুক্সেমবুর্গ, ২০০৩) এর বহুবছর পরে বিদ্যমান পুঁজিবাদ বিশ্লেষণ করেছেন আর্নেস্ট ম্যান্ডেল তাঁর *লেট ক্যাপিটালিজম* গ্রন্থে। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যুদ্ধ অর্থনীতি কীভাবে স্থায়ী রূপ নিয়েছে। (ম্যান্ডেল, ১৯৭৬)

ভ. ই. লেনিন তাঁর *ইম্পেরিয়ালিজম– দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম* প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে। নিকোলাই বুখারিন এর আগে সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে একটি খসড়া রচনা করেছিলেন। লেনিনের তাত্ত্বিক সূত্রায়নে ব্যাংক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির একীভবনে লগ্নীপুঁজির উদ্ভবকে সাম্রাজ্যবাদের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে উপস্থিত করা হয়। এ ছাড়া তিনি পুঁজি রপ্তানিকে পুঁজিবাদের নতুন পর্যায় হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি দেখান যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন তার সম্প্রসারণের তাগিদ উপস্থিত করে। তা নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধ ও সমঝোতা দুটোই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম কৌশল হিসেবে দেখা যায়। বিশ্বকে ভাগবাটোয়ারা করে নেওয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের অপরিহার্য প্রবণতা হিসেবে দেখা দেয়।

লেনিনের এই গ্রন্থ এরপর থেকে গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদের বৈশ্বিক রূপ, তার অন্তর্নিহিত প্রবণতা, সংকট ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে কিংবা এ সম্পর্কিত বিতর্কের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান নিয়ে আছে। এই গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পর্কে কিংবা পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তরের ধারাবাহিকতাকে খুব সংক্ষেপে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে এভাবে: '(১) ১৮৬০-৭০ সময়কাল ছিল প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়। এই সময়ে সাম্রাজ্যবাদের ছিল ভ্রুণাবস্থা। (২) ১৮৭৩ এর সংকটের পর একটা লম্বা সময় ধরে পুঁজিবাদের সংঘ কার্টেল গঠনের প্রক্রিয়া চলে। কিন্তু তা সেসময়ও কোন স্থায়ী রূপ পায়নি। এবং (৩) উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অতিউৎপাদন এবং ১৯০০-এর বিরাট সংকটের পর কার্টেল হয়ে দাঁড়ায় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। পুঁজিবাদ রূপান্তরিত হয় সাম্রাজ্যবাদে।' (লেনিন, ১৯৭৭; ২৬৬)

লেনিনের *সাম্রাজ্যবাদ* গ্রন্থ রচনার সময়কালে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান ছাড়া বিশ্বের প্রায় পুরো অংশই ছিল উপনিবেশ। লেনিনের লেখা থেকে বিশ শতকের শুরুর দিকের বিশ্বব্যবস্থার চিত্রও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন : 'বিংশ শতাব্দীতে আমরা নতুন ধরনের একচেটিয়া গড়ে উঠতে দেখছি : প্রথমত, সকল পুঁজিবাদী উন্নত দেশে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর সমিতি গড়ে উঠেছে এবং দ্বিতীয়ত, খুব অল্পসংখ্যক খুবই ধনী দেশের একচেটিয়া অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে পুঁজির পুঞ্জিভবন বিশাল আকার ধারণ করেছে। অগ্রসর দেশগুলোতে বিপুলাকার 'পুঁজির উদ্বৃত্ত' সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে এই উদ্বৃত্ত পুঁজি নিজ দেশের অনগ্রসর অঞ্চলকে উন্নত করা বা ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহৃত হবার বদলে এর মুনাফার আশায় রফতানি করা হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোতে। কেননা, এসব অনুন্নত দেশে মুনাফা সাধারণত উঁচু, পুঁজির ঘাটতি আছে, জমির দাম কম, মজুরির মাত্রা নীচু, কাচাঁমাল সস্তা। এই পুঁজি রফতানির মধ্য দিয়ে অনুন্নত দেশগুলো পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার আওতায় আসছে।' (লেনিন, ১৯৭৭; ২৪১-৪২)

১৯১৬ সালে লেনিনের *সাম্রাজ্যবাদ* গ্রন্থ প্রকাশের পর শতবর্ষ পার হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় শতবর্ষ পরেও একচেটিয়াকরণের রূপ, লগ্নী পুঁজির অধিকতর শক্তিবৃদ্ধি, পুঁজি রপ্তানি, বিশ্ব ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা আছে। তবে গত এক শতকে প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি, বৈশ্বিক কাঠামো ইত্যাদিতে অনেক নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে।

লেনিন তাঁর সময়ের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহকে ভাগ করেছিলেন এভাবে: (১) প্রাক পুঁজিবাদী সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা পালনকারী রাশিয়া, (২) পুরনো বিশাল শক্তি কিন্তু উন্নয়নের হার পড়তির দিকে এরকম দেশ ফ্রান্স ও বৃটেন এবং (৩) নবীন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও জাপান যেগুলোর উন্নতি অসাধারণ দ্রুত।

এই দেশগুলোর বিকাশধারায় কয়েক দশক পরে আমরা দেখি (১) রাশিয়া বিপ্লবী রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে; (২) ফ্রান্স বৃটেন ক্রমে দ্বিতীয় সারিতে নেমে এসেছে এবং (৩) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পরপরই জাপান ও জার্মানি অবস্থান নিয়েছে।

১৯১৬ সালে লেনিনের *সাম্রাজ্যবাদ* গ্রন্থ প্রকাশের পর শতবর্ষ পার হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় শতবর্ষ পরেও একচেটিয়াকরণের রূপ, লগ্নী পুঁজির অধিকতর শক্তিবৃদ্ধি, পুঁজি রপ্তানি, বিশ্ব ভাগ বাঁটোয়ারা করে

নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা আছে। তবে গত এক শতকে প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি, বৈশ্বিক কাঠামো ইত্যাদিতে অনেক নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে বৃটেনের পর একক কর্তৃত্বধর হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানেরও বিকাশ হয়েছে।[১]

বিশ্বায়ন কিংবা একচেটিয়া পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ

> ৩০ থেকে ৫০টি সংস্থার হাতে বিশ্বের অর্থকরী সম্পদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কেন্দ্রীভূত। এরা সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছে বুদবুদ কিন্তু যা জলাশয় বা প্রকৃত অর্থনীতির তুলনায় বহুগুণ বেশি শক্তিশালী। ক্রমবর্ধমান আর্থিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'অদ্ভুত' নতুন সব বাজারের উদ্ভব হয়েছে।

গত কয়েক দশকে 'বিশ্বায়ন' বলে একটি শব্দ চালু হয়েছে। আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্যে দিয়ে পুঁজি রাষ্ট্র অতিক্রম করেছে, পুঁজির অন্তর্গত তাগিদে এবং প্রযুক্তিগত সমর্থনে তার প্রবাহের গতি অনেক বেড়েছে। বিশ্ব এখন অনেক নিকটবর্তী, বিশ্বের সকল অঞ্চল পুঁজির আওতায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর থেকেই এই নামকরণ বেশি প্রচার পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যা 'আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিবাদ' তাকে নরম করে 'বিশ্বায়ন' বলে অভিহিত করতে মূলধারার বিশেষ আগ্রহ। যেমন পুঁজিবাদ না বলে তথাকথিত 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি'। নামকরণের মধ্যেও ক্ষমতার দাপট বা রাজনীতি আছে।

যাইহোক, এই পর্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক তাত্ত্বিক স্কুল জন্ম নিয়েছে। ১৯৪০/৫০ দশকে উন্নয়নের আধুনিকীকরণ তত্ত্বের বিপরীতে জন্ম নিয়েছিল নির্ভরশীলতা তত্ত্ব।[২] এই তত্ত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে উত্তর-উপনিবেশ দেশগুলোর সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার নতুন বিন্যাস চিহ্নিত করেছে। দেখিয়েছে তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বের অনুন্নয়ন কীভাবে কেন্দ্রের উন্নয়নের অপর পিঠ। 'বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব' গোষ্ঠী, বর্তমানে যাকে বিশ্বায়ন বলা হয় তাকে নতুন কোন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নেয় না। ওয়ালারস্টেইন (২০০০) মনে করেন, বিশ্বায়ন নতুন কিছু নয়। এটা ৫০০ বছর ধরেই চলছে। এসব তত্ত্বে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো কেন্দ্র বা Core এর মধ্যে আছে পুরো ব্যবস্থার কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহ– পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা। দ্বিতীয় হচ্ছে পরিধি– এতে আছে সেসব অঞ্চল যেগুলো বল প্রয়োগের মাধ্যমে উপনিবেশীকরণ বা অন্য কোনো ভাবে অধীনস্ত করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো হল ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব ইউরোপ। তৃতীয় হচ্ছে আধা পরিধি। এর মধ্যে আছে সেসব দেশ যেগুলো আগে কেন্দ্রে ছিল এখন দুর্বল হয়েছে কিংবা আগে পরিধি ছিল এখন সবল হয়েছে।

বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে শ্রেণী, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার কোনো কিছুই মুখ্য নয়– পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বব্যবস্থাই একটি একক। ওয়ালারস্টেইন স্পষ্ট করেই দাবি করেন, জাতিরাষ্ট্রের এখন আর কোনো নির্ধারক ভূমিকা নেই। বিশ শতকের শেষ থেকে একুশ শতকের প্রথম পর্যন্ত যে পরিবর্তনের ধারা তৈরি হচ্ছে তাতে বিশ্বব্যবস্থা দ্রুত একটি রূপান্তরের দিকে যাচ্ছে যা ২০৫০ সালের মধ্যে চূড়ান্ত রূপ পাবে। এই ব্যবস্থা এখন পতনের সংকটে ভুগছে।

বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিক 'বৈশ্বিক পুঁজিবাদী কাঠামো'তে তাঁদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্বায়ন বিশ্ব পুঁজিবাদ বিকাশের একটি পর্ব। ক্লেয়ার (২০০০) তাঁর তত্ত্বে ট্রান্সন্যাশনাল ধারার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ট্রান্সন্যাশনাল তৎপরতাই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট। এর তিনটি মুখ আছে : ক. অর্থনৈতিক– যার প্রধান চালিকা শক্তি ট্র্যান্সন্যাশনাল পুঁজি; খ. রাজনৈতিক– যার প্রধান চালিকা শক্তি ট্রান্সন্যাশনাল পুঁজিপতি শ্রেণী; এবং গ. সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক যার প্রধান এজেন্ট বুদ্ধিজীবী সাংস্কৃতিক এলিটরা। ট্রান্সন্যাশনাল পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে এমন একটি শ্রেণী, যার মধ্যে বিভিন্ন দেশের সামাজিক গোষ্ঠী আছে যারা নিজ নিজ দেশে প্রভুত্বকারী বৈদেশিক পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া সম্প্রসারণের মধ্যেই নিজেদের স্বার্থ দেখে। পাশাপাশি ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বায়িত আমলা, রাজনীতিবিদ ও পেশাজীবী। রবিনসনও (২০০৪) অনুরূপ তিনটি দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এগুলো হল: ট্রান্সন্যাশনাল উৎপাদন, ট্রান্সন্যাশনাল পুঁজিপতি, ট্রান্সন্যাশনাল রাষ্ট্র। তাঁর মতে, বিশ্ব অর্থনীতি (World Economy) থেকে বৈশ্বিক অর্থনীতি (Global Economy) একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের স্বাক্ষর।

অতিজাতীয় বা বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার বাহন হয়ে উঠছে– ট্রাইল্যাটারাল কমিশন, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, গ্রুপ অব সেভেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং জাতিসংঘের বহুবিধ প্রতিষ্ঠান।

হার্ট এবং নেগরি মার্কসের সঙ্গে ফুকোর সম্মিলনে বিশ্বায়নের উত্তরাধুনিক তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। তাঁদের মতে বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদের সাম্রাজ্য আগের দিনের ইউরোপীয় কর্তৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন। বর্তমান সাম্রাজ্যের কোনো কেন্দ্র নেই, এটি একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা যেখানে কোনো নিদিষ্ট পরিচালিকা শক্তি/এজেন্ট/শ্রেণী নেই। এখন ক্ষমতা বিস্তৃত, বিকেন্দ্রীকৃত। (হার্ট ও নেগরি, ২০০২)

বিশ্বায়নকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও বিকাশের সাথে সম্পর্কিত করে দেখেছেন ক্যাস্টেল তাঁর *দ্য রাইজ অব নেটওয়ার্ক সোসাইটিতে*। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় নতুন দিক বলতে তিনি কিছু ধারণা ও বাস্তবতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রধান : (১) তথ্য ও জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতি (২) বৈশ্বিকভাবে উৎপাদন এবং (৩) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অন্যতম উৎস বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক। ডেভিড হার্ভে time-space compression এর কথা বলেছেন। গিডেন্স universalization of modernity ধারণা এনেছেন। ফুকোর ধারণায় আধুনিক রাষ্ট্রের নজরদারি গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। বর্তমান পুঁজিবাদকে 'লেট ক্যাপিটালিজম' বলে অভিহিত করেছেন আর্নেস্ট ম্যান্ডেল। গিডেন্স এনেছেন 'লেট মডার্নিটি' ধারণা। তিনি জাতিরাষ্ট্রের চার খুঁটির কথা বলেছেন (১) পুঁজিবাদ (২) শিল্পবাদ (৩) নজরদারি (৪) সামরিক শক্তি। কোকোকোলাইজেশন ম্যাকডোনাল্ডাইজেশন আমেরিকানাজাইজেশন ইত্যাদি ধারণাও এসব আলোচনায় গুরুত্বের সঙ্গে আনা হয়েছে। সমরূপীকরণ (Homogenization) বা পুঁজির স্বার্থে চাহিদা সংস্কৃতি সবকিছু একাকার করে ফেলার বৈশ্বিক পুঁজি চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও আছে-এর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, সাংস্কৃতিক সংঘাত বিভিন্ন মাত্রা নিচ্ছে। আবার ফিউশন দেখছি আমরা বহুরকম।

১। এই ধারাবাহিকতা ও নতুন সংযোজন নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য দেখুন- আনু মুহাম্মদ: *বিশ্বায়নের বৈপরীত্য*, প্রথম অধ্যায়।

২। এই তত্ত্বগুলো নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য দেখুন- আনু মুহাম্মদ: *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*, প্রথম অধ্যায়।

পল সুইজি ১৯৭৪-৭৫ এর অর্থনৈতিক মন্দার সময় থেকে বিশ্ব পুঁজির যাত্রায়, তাঁর মতে, 'তিনটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধারা'- কে চিহ্নিত করেছেন এইভাবে : (১) প্রবৃদ্ধির সামগ্রিক হার হ্রাস পাওয়া; (২) কতিপয় বহুজাতিক কর্পোরেশনের বিশ্ব জুড়ে আধিপত্য; এবং (৩) সেই প্রক্রিয়া যাকে বলা যেতে পারে পুঁজিবাদের আর্থিকীকরণ বা ফিন্যান্সিয়ালাইজেশন। (সুইজি, ১৯৯৭)

পুঁজিবাদের নিউ লিবারেল নামে পরিচিত অধিকতর গোঁড়া ফ্রিডম্যানপন্থী কোম্পানিমুখি ধারার দৃষ্টিতে কোনকিছুই মুনাফা মুখি ব্যবসায়িক তৎপরতার বাইরে থাকতে পারে না। সুতরাং নদী-নালা, খাল-বিল, শিক্ষা, চিকিৎসা কোনকিছুই পুঁজির আওতার বাইরে থাকতে দেবে না তারা। ১৯৭০ দশক থেকে এই গোঁড়া পুঁজিবাদী দর্শনের আধিপত্য আরও জোরদার হয়েছে। তিনটি কালপর্বে এই মতবাদ তার শক্তিবৃদ্ধি করেছে : (১) ১৯৭০-এর দশকে এর সূত্রপাত, ১৯৮০ দশকে একে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। (২) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে পুঁজিবাদী কেন্দ্রের ক্ষমতা একচেটিয়া হয়েছে এবং (৩) ২০০১ সাল থেকে তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহৎ কর্পোরেট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে।

১৯৭০ দশক থেকে বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজি বিনিয়োগের ধরনের মধ্যেও একটা পরিবর্তন ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। শিল্পখাতে বিনিয়োগ কমে পরিষেবা খাতের দিকে পুঁজি প্রবাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে; মানে ব্যাংক, বীমা, শেয়ার মার্কেট, দোকানপাট, বিনোদন, ক্যাসিনো ইত্যাদি। এই ধারাতেই উদ্ভূত হয় নিয়ন্ত্রণহীন অ-ব্যাংক বিনিয়োগ সংস্থা, হেজ ফান্ড এবং তাদের অবাধ তৎপরতা। নানারকম উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে, উৎপাদন বিচ্ছিন্নভাবে, দ্রুত টাকা বানানোর নানাকায়দা তৈরি হয়েছে এই আবহেই।

তিনটি কালপর্বে এই মতবাদ তার শক্তিবৃদ্ধি করেছে : (১) ১৯৭০-এর দশকে এর সূত্রপাত, ১৯৮০ দশকে একে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। (২) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে পুঁজিবাদী কেন্দ্রের ক্ষমতা একচেটিয়া হয়েছে এবং (৩) ২০০১ সাল থেকে তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহৎ কর্পোরেট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে।

৯০ দশকের প্রথমদিক থেকে আইটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদির বাজারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। কর্মসংস্থানও এসব খাতেই বেশি বৃদ্ধি পায়। এই খাতেও কয়েক বছরের মধ্যে একটা বড় ধরনের ধস নামার পরে গৃহায়ন খাতে আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। মুনাফার সন্ধান পেয়ে পুঁজি যখন কোনদিকে যায় তখন লাগামছাড়া ভাবে সেদিকেই ছুটতে থাকে, এর ফলে অতিবিনিয়োগসহ নানাবিধ ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এসব অসঙ্গতি ও অস্থিরতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। নতুন পরিষেবা খাতে কাজ খুবই অস্থায়ী ধরনের, নিরাপত্তাহীন এবং অধিকাংশের মজুরিও অনেক কম। আউটসোর্সিং এসব খাতে কর্মসংস্থানের অন্যতম ধরন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কর্মসংস্থান এরকম অনিশ্চিত, 'হায়ার এবং ফায়ার' নিয়োগকারীর হাতে। এদের বড় অংশ আবার অভিবাসী, যাদের বড় অংশই যে কোন সংকটের প্রথম শিকার।

বিগত দশকগুলিতে বিশ্ববাণিজ্য দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। বেশিরভাগ দেশের অর্থব্যবস্থা একক বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে গভীরভাবে। তথ্যপ্রযুক্তি দ্রুত বিকশিত হওয়ার কারণে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক দ্রুততহারে বিকশিত হয়েছে। শ্রমিকদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার বিষয়ে বাধা-নিষেধ যদিও বহাল আছে, সারা বিশ্বে এবং বিভিন্ন দেশে এমন সব সংস্কার করা হয়েছে যার ফলে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পুঁজির চলাচল সুনিশ্চিত হয়েছে।

একদিকে বিশ্ব-পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান সামরিকীকরণ ও আর্থিকীকরণ (ফিন্যান্সিয়ালাইজেশন), অপরদিকে নাগরিক পরিষেবা ও সাধারণ সম্পদের দ্রুত ব্যক্তিমালিকানাধীন করণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে তথাকথিত নব্য উদারতাবাদী পর্বের পুঁজিপন্থী পুনর্গঠন গত কয়েক দশকে জোরদার হয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের (যেমন ভূমি-সংস্কার এবং প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার) প্রশ্ন পাল্টে ফেলে 'ওয়াশিংটন ঐকমত্যে'র প্রভাবে 'কাঠামোগত সামঞ্জস্যবিধান' ধারণার আধিপত্য তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, নিরাপদ পানীয় জল এবং জ্বালানি শক্তি-ব্যবহার সক্ষমতার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে বোঝা হিসেবে দেখিয়ে সামরিক বাজেট, কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে দেওয়া ভর্তুকি আর কর ছাড়ের সুবিধাগুলির সম্পদ সংগ্রহ করা হচ্ছে। কৃচ্ছতাসাধনের হাতিয়ার তাক করা হয়েছে জনগুরুত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যয়গুলির প্রতি।

ডেভিড হার্ভেও তাঁর বিশ্লেষণে এই বিষয়টি পরিস্কার করেছেন যে, নির্দিষ্টভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাজেট যে কাটছাঁট করা হচ্ছে, তার পিছনে আছে এই অর্থব্যবস্থার ভেতরের প্রবল চাপ। কারণ, সামাজিক পুনরুৎপাদনের ব্যয় (যেমন শিশু, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধদের যত্ন, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যপরিষেবা জনিত ব্যয়) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অংশ হিসেবে অব্যাহত রাখা পুঁজির পক্ষে সবসময়ই অসুবিধাজনক ছিল। (হার্ভে ২০১১; ২৬৫) এর বিপরীতে নব্য উদারতাবাদী ধারণা হল আক্রান্ত জনগণ নিজেরাই এসব ব্যয়ভার বহন করবে। এর জন্য আর্থিক খাতের আরও প্রসার ঘটাতে হবে। এই কারণেই সামির আমিন বলেছেন, 'আর্থিকীকরণ কোনো স্খলন (বা ব্যত্যয়) নয় যাকে উপযুক্ত বিধিনিয়ম দিয়ে সংশোধন করা যেতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থা বহাল রাখার প্রক্রিয়ার সাথে এটি অবিচ্ছেদ্য।' (আমিন, ২০১০)

ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে ৯০ দশক থেকে নন-ব্যাংক বিনিয়োগ সংস্থার বিকাশ ঘটতে থাকে খুব দ্রুত। যেগুলোর উপর রাষ্ট্রীয় কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই কিন্তু যাদের বিনিয়োগের নানাপথ উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে বিপুল পুঁজির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ এসেছে। তৈরি হয়েছে এমন সব আর্থিক পণ্য যেগুলো একেবারেই কাগুজে, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নাই। এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০৮ সালে পুরো ব্যবস্থার ধ্বস স্পষ্ট হবার সময় ব্যাংক ও অব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদের পরিমাণ প্রায় সমান হয়ে গিয়েছিল। সর্বশেষ আরেক হিসাবে দেখা যায়, ৩০ থেকে ৫০টি সংস্থার হাতে বিশ্বের অর্থকরী সম্পদের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কেন্দ্রীভূত। এরা সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছে বুদবুদ কিন্তু যা জলাশয় বা প্রকৃত অর্থনীতির তুলনায় বহুগুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠে। ক্রমবর্ধমান আর্থিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'অদ্ভুত নতুন সব বাজারের' উদ্ভব হয়। এই বাজারদের পথিকৃৎ হল তারা যাদের 'ছায়া ব্যাংকিং' বলা হয়। এই পরিষেবায় ঋণ-বিনিময়, কারেন্সি ডেরিভেটিভ (প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে মূলধন-সংস্থাপন-পত্র) এবং এই ধরনের আরও বিনিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা হল, যার মাধ্যমে দূষণের অধিকার থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়

সব কিছু নিয়েই জুয়া খেলা চালানো যেতে পারে। মুনাফার উন্মাদনা, অপরিমিত ক্ষমতা আর অনিয়ন্ত্রিত যাত্রা অর্থনীতিকে কৃত্রিমভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে যা এক পর্যায়ে ফেটে যেতে বাধ্য হয়। (মুহাম্মদ, ২০১০)

অধিকতর উচ্চহারে মুনাফা আয়ের আরেকটা পদ্ধতি গত কয়েক বছরে বিকশিত হয়েছে, সেটা হল ভবিষ্যৎ বিক্রি। এটি হল সম্পূর্ণ সম্ভাবনার উপর কেনাবেচা এবং তার উপর নানাস্তরে বন্ধকী কাগজ তৈরি ও তা নিয়ে ব্যবসা, বাজী ধরা বা জুয়া খেলার আরও ভয়ংকর রূপ। হাওয়ার উপর কেনাবেচা হচ্ছে, একজন আরেকজন আরেকজন, সে আবার বিক্রি করল বেশি দামে। এভাবে চলছেই। প্রকৃত অর্থনীতির বা উৎপাদন মাত্রার সাথে এর কোন সম্পর্কই নাই।

প্রযুক্তির বিকাশ কিংবা প্রাণ প্রকৃতি বিনাশ

'অটোমেশনের দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পুঁজিবাদের সকল ঐতিহাসিক স্ববিরোধিতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একদিকে, এটি বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তির চমৎকার বিকাশ নির্দেশ করছে যা যান্ত্রিক, পুনরাবৃত্তিমূলক, একঘেঁয়ে এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শ্রমদানের বাধ্যবাধকতা থেকে মানবসমাজকে মুক্ত করবার ক্ষমতা ধারণ করে। অন্যদিকে, এটিই আবার কর্মসংস্থান ও আয়ের উপর নতুন হুমকি সৃষ্টি করে : নতুনভাবে উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা একটানা গণবেকারত্বে প্রত্যাবর্তন, ভোগ আয়ের পতন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক অবনতিকে তীব্রতর করে। পুঁজিবাদী অটোমেশন তাই একইসঙ্গে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এবং পণ্য ও পুঁজির বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসাত্মক বিপুল বিকাশের চরিত্র সম্পন্ন হিসেবে তার বস্তুগত বৈরী দ্বন্দ্বকেই স্পষ্ট করে তুলছে।' -আর্নেস্ট ম্যান্ডেল

'অনলাইন জগত এখন পুঁজিবাদের এখন নতুন দখলক্ষেত্র। নতুন পণ্য উৎপাদনের বদলে ডাটা সংগ্রহ, ব্যক্তি তৎপরতার ওপর নিয়ন্ত্রণ, মহাশূণ্য থেকে একান্ত ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে আগ্রাসনের পথ ও পদ্ধতির প্রযুক্তি এখন পুঁজির করায়ত্ত।'

প্রযুক্তির বিকাশ মানুষকে আরাম দেবার বদলে, পুঁজির কর্তৃত্বের কারণে, আরও দুর্যোগের মুখে ফেলেছে। কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে, তার ওপর নজরদারি বেড়েছে, প্রকৃতি ও মানুষের ওপর আক্রমণ বেড়েছে। আরও বিস্তৃত হয়েছে যুদ্ধ অর্থনীতি।

প্রযুক্তিগত উল্লম্ফন এবং পুঁজিবাদের বর্তমান বিশ্বায়িত একচেটিয়া রূপের সামনে দাঁড়িয়ে আর্নেস্ট ম্যান্ডেল তাই সঠিকভাবেই বলেছেন, 'পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অপচয়ের নিকৃষ্ট রূপ বিদ্যমান উৎপাদনের বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের অপচয়ের মধ্যে নিহিত; মুক্ত পুরুষ ও নারীর বিকাশের জন্য ব্যবহারের পরিবর্তে সেগুলো বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর উৎপাদনে।' (ম্যান্ডেল, ১৯৭৬; ২১৬)

যুদ্ধ অর্থনীতির বিকাশ পুঁজিবাদের জন্য, তার বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুদিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোকে সারসংক্ষেপ করা যায় নিম্নরূপে : (১) সম্পদের পুনর্বিতরণ ছাড়াই তা গড় চাহিদা বৃদ্ধি করে ; (২) অব্যাহত প্রচারণার কারণে সমাজে এই ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হয় যে, তাদের নিরাপত্তার জন্য অব্যাহত যুদ্ধ তৎপরতা ও নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে অর্থব্যয় খুবই জরুরি ; (৩) পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সবচাইতে নাজুক অবস্থায় থাকে যে মূলধনী পণ্য শিল্প তা চাঙ্গা হয় যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের জোয়ারের কারণে ; (৪) যেহেতু প্রধানত বৃহৎ সংস্থাই (সেইসাথে বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থা) যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করে সেহেতু তা বাজার প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করতে পারে ; (৫) বৃহৎ রাষ্ট্রের আধিপত্য নিশ্চিত করে পুঁজির সম্প্রসারণ সহজ হয় ; (৬) দেশের ভেতর যুদ্ধোন্মাদনা তৈরি করে জনগণকে আচ্ছন্ন রাখা সহজ হয়। (হান্ট, ১৯৭৬; ৩৯৩)

মার্কিন গবেষক উইলিয়াম ব্লুমের গবেষণা অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৭০টিরও বেশি সামরিক আগ্রাসনে যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত ছিল। বিশ্বের সবচাইতে নিকৃষ্ট সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি সনাক্ত করেছেন। ৪০ এর দশক থেকে শুরু করে গত কয়েক দশকে বিশ্বে পারমাণবিক সমরাস্ত্রের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু এর প্রথম ও শেষ প্রয়োগ করেছে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগষ্ট। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও জাপানের নিরীহ লক্ষ মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করবার শক্তিমত্তা দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আসলে যা করতে চেয়েছে সেটা হলো প্রথমত, পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে নিজের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা; দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সরাসরি হুমকি প্রদর্শন করা; এবং তৃতীয়ত, জাপানের উপর পূর্ণ দখল নিশ্চিত করা।

রুশ বিপ্লব, বিপ্লব-উত্তর নির্মাণ, মহামন্দা থেকে মুক্ত অর্থনীতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা নিশ্চিত করা, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী-লিঙ্গ বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সফলভাবে মোকাবিলা ইত্যাদি ঘটনাবলী পুঁজিবাদী বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে তাই শুধু শ্রমিক শ্রেণী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ, তরুণ এবং সাংস্কৃতিক জগত এমনকি হলিউডেও তা জনপ্রিয় প্রভাব তৈরি করেছিল। সেসময় কট্টর পুঁজিপন্থীদের মুখপাত্র হিসেবে হাজির হয়েছিলেন সিনেটর ম্যাকার্থি, যিনি যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে কমিউনিজম ভীতি ছড়িয়ে নিপীড়ন হয়রানি ও ত্রাসের এক রাজত্ব তৈরিতে নেতৃত্ব দেন যা ম্যাকার্থিজম নামে পরিচিত হয়। এই সময়ে পুলিশী হয়রানি, চাকুরিচ্যুতি, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সম্প্রসারণ ইত্যাদি ভয়ংকর রূপ নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, লেখক, শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। আটক, খুন, গুম, চাকুরিচ্যুতি সবই ভয়াবহ আকার নেয়। এটি আবার বহুগুণ হয়ে ফেরত আসে 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের' নামে ২০০১ এর পর থেকে। বিভিন্ন দেশে আমরা এর অবিরাম প্রয়োগ দেখছি।

আফগানিস্তান যুদ্ধে সোভিয়েতপন্থী সরকার উচ্ছেদে গোপন যুদ্ধ ও গোয়েন্দা তৎপরতায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। সেসময় প্রত্যক্ষ তদারকিতে মার্কিন প্রশাসন ইসলামপন্থী বহু সশস্ত্র গোষ্ঠী তৈরি করে। আলকায়েদা, তালেবানদের পর তৈরি হয়েছে আইসিস, দেশে দেশে অসংখ্য নামের নতুন নতুন গোষ্ঠী। যার অছিলায় বিশ্বজুড়ে সামরিকীকরণ, গোয়েন্দা সংস্থার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি, মতপ্রকাশসহ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, খুন-গুম সবই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের টুইনটাওয়ার হামলার ওপর ভর করে ২০০১ সালের পরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে ব্যয় ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে দেশে বিদেশে প্রাইভেট সেনা ও পুলিশ ঠিকাদারদের বরাদ্দ, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্ষমতা ও বরাদ্দ। অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা, মেডিকেয়ারসহ গরীবদের নানা কর্মসূচি সংকুচিত হয়েছে। জেমস পেট্রাসের ভাষায় কল্যাণমুখি কর্মসূচির সংকোচন ও পুলিশী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তারে জন্ম হয়েছে financial-security power elite. (পেট্রাস, ২০১২)

আর্নেস্ট ম্যান্ডেল পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন,

পুঁজিবাদের এই পর্যায়ে মার্কসের সূত্র অনুযায়ী অর্থনীতি শুধু পুঁজিপণ্য আর ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের দুটো বিভাগ দিয়েই পরিচালিত হয় না। এখন এখানে যোগ হয়েছে আরেকটি বিভাগ ধ্বংস বিভাগ। তিনি সমরাস্ত্র খাতের অভূতপূর্ব বিকাশ এবং সকল উৎপাদনী খাতের ওপর তার কর্তৃত্ব বিস্তারকে পুঁজিবাদের জন্য অনিবার্য দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পুঁজিবাদে যুদ্ধ সমরাস্ত্র কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, কারণ এই ব্যবস্থা স্থায়ী যুদ্ধ অর্থনীতি দ্বারাই পরিচালিত। (ম্যান্ডেল, ১৯৭৬)

নজরদারি আর পরিবেশ বিপর্যয়

> 'অনলাইন জগত এখন পুঁজিবাদের নতুন দখলক্ষেত্র। নতুন পণ্য উৎপাদনের বদলে ডাটা সংগ্রহ, ব্যক্তি তৎপরতার ওপর নিয়ন্ত্রণ, মহাশূণ্য থেকে একান্ত ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে আগ্রাসনের পথ ও পদ্ধতির প্রযুক্তি এখন পুঁজির করায়ত্ত।' -শুশানা যুবফ

বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদের গতিমুখ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য পুঁজিবাদের সাথে ক্রমবর্ধমান নজরদারি, পরিবেশ বিপর্যয় এবং সন্ত্রাস-যুদ্ধকে যুক্ত করে দেখার, এগুলোর জৈবিক সম্পর্ক উপলব্ধি করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন অনেক তাত্ত্বিক। কেউ 'সারভেলেন্স ক্যাপিটালিজম', কেউ 'ডিসাস্টার ক্যাপিটালিজম', বা কেউ 'ওয়ার ক্যাপিটালিজম' ইত্যাদি নামে অভিহিত করছেন। পুঁজিবাদের এগুলো বর্তমান বৈশ্বিক প্রবণতা হলেও বিভিন্ন দেশে শাসক শ্রেণীর গঠনের পার্থক্যের সাথে এর মাত্রাভেদ আছে। বাংলাদেশে আমরা এর প্রত্যেকটিরই জোরদার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।[৩]

মার্কস বলেছিলেন, 'উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ যা শ্রমিকদের চূড়ান্ত সংখ্যা কমিয়ে দেয় অর্থাৎ যা পুরো জাতিকে আগের চাইতে কম সময়ে পুরো উৎপাদন সম্ভব করতে সক্ষম করে তোলে তা প্রকৃতপক্ষে একটি বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু পুঁজিবাদের অধীনে প্রযুক্তিগত বিকাশের এই সুবিধা অধীনস্ত থাকে মুনাফা বৃদ্ধির সুতরাং এটা আবারও পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধক চরিত্রকে স্পষ্ট করে এবং দেখায় যে পুঁজিবাদী উৎপাদন কোন ভাবেই উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের এবং সম্পদ সৃষ্টির চূড়ান্ত রূপ নয় বরঞ্চ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে তা এই বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।' (মার্কস, ১৯৬৯; ২৬৩-৬৪)

নাওমি ক্লেইন তাঁর *শক ডকট্রিন* গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিবাদের বিস্তার প্রাণ প্রকৃতি মানুষ ও সম্পদের ভয়াবহ বিপর্যয় তৈরি করছে। (ক্লেইন, ২০০৭) নজরদারি পুঁজিবাদ বা Surveillance capitalism ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন জন বেলেমি ফস্টার ও রবার্ট মেকচেসনি, ২০১৪ সালে। (ফস্টার এবং ম্যাকেনসি ২০১৪) পরে এবিষয় নিয়ে আরও লিখেছেন শুশানা যুবফ। যুবফ দেখান এই নজরদারি পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে অর্থকরী খাতের আধিপত্য, ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন, নব্য উদারতাবাদী আগ্রাসনের সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে। একসময়ে ফোর্ড ও জেনারেল মটরস গণ উৎপাদনের সূত্রপাত করিয়ে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল বর্তমান সময়ে প্রথমে গুগল ও পরে ফেসবুক বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নজরদারির মধ্যে আনার মধ্য দিয়ে তার চাইতেও আগ্রাসী একটি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তিনি আরও বলেছেন, 'অনলাইন জগত এখন পুঁজিবাদের এখন নতুন দখলক্ষেত্র। নতুন পণ্য উৎপাদনের বদলে ডাটা সংগ্রহ, ব্যক্তি তৎপরতার ওপর নিয়ন্ত্রণ, মহাশূণ্য থেকে একান্ত ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে আগ্রাসনের পথ ও পদ্ধতির প্রযুক্তি এখন পুঁজির করায়ত্ত।' (যুবফ, ২০১৫)

পুঁজির বিশ্বযাত্রায় বর্তমান সময়ে প্রধান বাহন ডিজিটাল প্রযুক্তি। কর্পোরেট প্রচারণা, তথ্য বিকৃতি, ভুল তথ্য তৈরি ও দ্রুত প্রচার সবই এখন অনেক দ্রুতগতি সম্পন্ন, এই যুক্ততায় মুনাফার হারও উর্ধ্বমুখি। যুবফ বলছেন, শিল্প পুঁজিবাদের গণ উৎপাদনে ভোক্তা বা নাগরিকেরা পুঁজির মালিকানা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ধারণা ছিল। বর্তমান ডিজিটাল ক্ষেত্রে নাগরিক বা ভোক্তারা অদৃশ্য অজানা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রায় অজান্তেই তার শিকার বা দাসে পরিণত হয়।

প্রযুক্তিগত বিকাশের কয়েকটি স্তরকে নির্দিষ্ট করে সেগুলোকে এক একটি স্বাধীন বিপ্লব হিসেবে দেখানোর রেওয়াজ আছে। প্রথমটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন, দ্বিতীয়টি বিদ্যুৎ, তৃতীয়টি ইন্টারনেট, চতুর্থত এর ওপর ভর করে ডিজিটাল যুগ।[৪] ডিজিটাল যুগ নিয়ে জনপ্রিয় বক্তা টম গুডউইন-এর একটি বক্তব্য বহুল উদ্ধৃত, তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্যাক্সি কোম্পানি উবারের নিজের কোনো ট্যাক্সি নেই, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিডিয়া ফেসবুক নিজে কোনো খবর তৈরি করে না, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাইকার আলিবাবার কোনো গুদাম নেই এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবাসন ব্যবসায়ী এয়ার বিএনবির নিজেদের কোনো বসতি নেই।' ঠিক। আর্থিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগ এমন জায়গায় বেশি হচ্ছে, যেখানে পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক পরোক্ষ। যেখানে মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের কাছে অজানা। যেখানে পুঁজি প্রকৃতই নিরাকার, ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য। আর শ্রম অনেকক্ষেত্রেই বেগার। কিন্তু এই আর্থিকীকরণ, অদৃশ্যকরণ ও প্রযুক্তিকরণ পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্কের মৌলিক দিক দূর করেনি। তবে শ্রমের আপেক্ষিক অবস্থান দুর্বল হয়েছে।

নজরদারি ব্যবস্থার একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হচ্ছে প্রিজম (Prism)। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার বক্তব্য থেকেই জানা যায় যে, নয়টি বৃহৎ নয়া প্রযুক্তিগত শীর্ষ প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট, এ্যাপল, গুগল, ইয়াহু, ফেসবুক, ইউটিউব, প্যালটক, স্কাইপ এবং এওএল (Microsoft, Apple, Google, Yahoo, Facebook, Youtube, PalTalk, Skype, AOL) এই প্রিজমের আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর করা পার্টনার বা অংশীদার। বিনা ব্যয়ে সকল নাগরিকের সকল বিষয়ে তথ্যভান্ডার সংগ্রহের এক অভূতপূর্ব পথ তৈরি হয়েছে এই কৃৎকৌশলের মাধ্যমে।

কর্তৃত্ববাদী শাসন, রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের কাজে এই প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে আরও অন্ধ, বিভ্রান্ত, ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, অনুগত, অসহায় তথ্যদাতা বানানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্বেষ ও সন্ত্রাস

গত প্রায় দুই দশকে মধ্যপ্রাচ্যে একের পর এক দেশে আগ্রাসন চালিয়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খুন করেছে ২০ লক্ষাধিক মানুষ, আরও বহু লক্ষ মানুষ হয়েছে উদ্বাস্তু, আরও বহুগুণ আতংকিত অনিশ্চিত জীবনের যাত্রী। এসব থেকে বেড়েছে ধর্মীয় সন্ত্রাস, বেড়েছে শরণার্থী সংখ্যা। সেই শরণার্থী বিষয় আবার তৈরি করছে জাতিগত সংঘাত।

৩। বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেল কীভাবে একইসঙ্গে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, উচ্চ মাত্রার পরিবেশ বিপর্যয় ও গণতন্ত্র বিনাশ করছে তার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন- আনু মুহাম্মদ: *প্রাণ প্রকৃতি বাংলাদেশ* (২০১৯)।

৪। অন্যভাবেও কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায় যেমন প্রথমটি কয়লা, দ্বিতীয়টি তেল, তৃতীয়টি গ্যাস ও চতুর্থটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি।

২০১১ সালের ২২ জুলাই নরওয়ের অসলোর ওতোয়া দ্বীপে লেবার পার্টির আয়োজনে শিক্ষার্থীদের একটি ইয়ুথ ক্যাম্প হচ্ছিলো যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল কিশোর কিশোরী। এই ক্যাম্পে নির্বিচার গুলিবর্ষণে নিহত হন ৭৭ জন। খুনি শ্বেতাঙ্গ তরুণ একটি চরমপন্থী বর্ণবাদী গ্রুপের সদস্য। বিচারকালে বলেছিল, সে বিশ্বাসঘাতকদের খুন করেছে যারা নরওয়েকে ইসলামিক উপনিবেশ বানাবার পথে সহযোগিতা করছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল নিউজিল্যান্ডে ২০১৯ সালে।

গত এক দশকে জার্মানিতে নব্য নাৎসীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিকভাবেও তারা এখন অনেক সংগঠিত। গত ২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ নির্বাচনে চরম ডানপন্থী দল এখানে শতকরা ১৩ ভাগ ভোট পেয়ে প্রায় ৭০টি আসন পেয়েছে, এর আগে যাদের একটিও আসন ছিল না। ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ এর মধ্যে নব্য নাৎসি সন্ত্রাসী গ্রুপ ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট আন্ডারগ্রাউন্ড ১৪টি সশস্ত্র ডাকাতি করেছে এবং ১১টি খুন করেছে। (ফেকেট, ২০১৬)। সমাজে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সন্ত্রাসীদের শক্তিবৃদ্ধির একটি বড় বহিপ্রকাশ ঘটেছে গ্রীসে ২০১৩ সালে। গ্রীস, স্পেন, পর্তুগাল ৭০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রের অভিজ্ঞতার মধ্যে গেছে। এতোবছর পরে গ্রীসে সামরিক শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়েছিল 'গোল্ডেন ডন' নামে একটি সংগঠনের নেতৃত্বে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। সামরিক বাহিনী ও প্রশাসনে এদের প্রভাব টের পাওয়া যায় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর। ইসলামের বিরোধী হিসেবেই অনেকগুলো চরমপন্থী দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। অভিবাসী, সমকামী, সমাজতন্ত্রী, গর্ভপাত ইত্যাদি বিরোধী গ্রুপ হিসেবেও তাদের তৎপরতা দেখা যায়। (রেজিস্টার, ২০১৫)

> পুঁজিবাদ অনেকগুলো মডেলের মধ্যে দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বস্তুত ইউরোপেরই সম্প্রসারণ, এর ফলে পুঁজিবাদ বিকাশে সেখানে ইউরোপীয় ধারাবাহিকতা যেরকম আছে, ভেঙে দেখলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী চেহারার নানাবিধ পার্থক্যও আছে।

একজন বিশেষজ্ঞ পশ্চিমা দেশগুলোতে তিনধরনের জাতি বর্ণ বিদ্বেষী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন। এগুলো হলো: (১) প্রত্যক্ষভাবে ফ্যাসিস্ট বা নব্য নাৎসি ভাবধারায় গঠিত; এর মধ্যে আছে গ্রিসের গোল্ডেন ডন, হাঙ্গেরীর জব্বিক, ইউক্রেনের রাইট সেক্টর, জার্মানির ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, ফ্রান্সের ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশন পার্টিসহ নানা ছোট ছোট গ্রুপ (২) আধা ফ্যাসিবাদী পার্টি, প্রত্যক্ষভাবে না বললেও ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত; যেমন ফ্রান্সের এফএন, অস্ট্রিয়ান ফ্রিডম পার্টি, বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ইন্টারেস্ট পার্টি ইত্যাদি। এবং (৩) চরম ডানপন্থী পার্টিগুলো, যেগুলো বর্ণবাদী, অন্য ধর্মবিদ্বেষী, অভিবাসী বিরোধী কর্মসূচি দ্বারা পরিচালিত; যেমন ইটালীয় নর্থার্ন লীগ, সুইস ইউডিসি, যুক্তরাজ্যের ইনডেপেন্ডেন্স পার্টি, ডাচ পার্টি ফর ফ্রিডম, নরওয়ের প্রগ্রেস পার্টি, ফিনস পার্টি, ডেনিশ পিপলস পার্টি ইত্যাদি (লওয়ি ও সিটেল, ২০১৬)।

'নয়া উদারনৈতিক' নামে পরিচিত কট্টর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে স্থিতিশীল কাজের ক্ষেত্র ও নিরাপত্তা সংকোচন, দমন পীড়নমূলক আইন, যুদ্ধমুখি তৎপরতায় দখলকৃত দেশ-ধর্ম-বর্ণ বিরোধী হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচারণা, সাম্য-অসাম্প্রদায়িকতা-সার্বজনীন মৌলিক অধিকার বিরোধী মতাদর্শের শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চরমপন্থী সাম্প্রদায়িক জাতি বর্ণবিদ্বেষী গোষ্ঠীগুলোর বিস্তার ঘটছে।

'উন্নয়ন', অনিশ্চিত জীবন ও বৈষম্য

'সর্বোচ্চ ধনী শতকরা ১ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় মোট বৃদ্ধির শতকরা ৬০ ভাগ হজম করেছে।'– টমাস পিকেটি

পুঁজিবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রান্তস্থ দেশগুলো অভিন্ন অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিতি পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। উপনিবেশ-উত্তর দেশগুলো এই ভিন্ন সত্ত্বার প্রধান শরীক ছিল। এই বিশ্বই পুঁজির আগ্রাসনের প্রধান ক্ষেত্র, যার সাথে যুদ্ধ ধ্বংসও অনিবার্যভাবে চাপানো হয়। আরব বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, অশান্তির সূচনা হয় ১৯৪৮ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে প্যালেস্টাইন ভূমিতে ইজরাইল রাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে। ১৯৫৩ সালে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে সিআইএ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর পুঁজির কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে। চিলিতে ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত সরকার উচ্ছেদ করে বসানো হয় কুখ্যাত জেনারেল পিনোচেটকে। এই স্বৈরশাসকের নেতৃত্বেই পুঁজিবাদের কট্টর ধারা প্রবর্তনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন এই ধারার তাত্ত্বিক মিলটন ফ্রিডম্যান। স্বাধীনতা মুক্তির লড়াই দমন করতে গিয়ে বিশ্ব পুঁজির স্থানীয় ব্যবস্থাপক হিসেবে খুঁটি গাড়ে স্বৈরতন্ত্রী সামরিক বেসামরিক শক্তি।

গত দুই দশকে বিশ্বায়ন নামে পুঁজির আন্তর্জাতিকীরণ হয়েছে দ্রুত। বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার উচ্চহার বজায় রাখবার জন্য কম মজুরির শ্রমিকদের দেশে কারখানা নিয়ে গেছে। যেখানে কর কম বা কর ফাঁকি দেওয়া যায়, যেখানে মজুরি কম, যেখানে মুনাফা সর্বোচ্চ করার সুবিধা বেশি, যেখানে দুর্নীতিবাজ সরকার ও আমলাদের দিয়ে যা খুশি করা যায় পুঁজি চলে গেছে সেখানেই। পুঁজির বিনিয়োগ সুবিধা একচেটিয়া করতে বহুদেশে অর্থনৈতিক সংস্কার করতে কোথাও দেনদরবার কোথাও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানির পথ প্রশস্ত করা হয়েছে। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ 'বিদেশি সাহায্যের' জালে দুর্বল দেশগুলোর আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সেসব সংস্থার জন্য অধিকতর লাভজনক করবার জন্য অনেকরকম সংস্কারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের সকল হাত, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ- এডিবি, সিআইএ, থিংক ট্যাংক, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, প্রচার প্রচারণা সবই কাজে লাগানো হয়েছে। সেই ধারায় যুক্তরাষ্ট্রসহ পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশগুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা ও বাণিজ্যিক তৎপরতা এসব দেশে নিয়ে গেছে। যে গাড়ির কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পায়নের আদি ভিত্তি তৈরি করেছিল সেসব কারখানা চলে গেছে মেক্সিকোতে, ভারতে, দক্ষিণ কোরিয়া বা চীনে। প্রযুক্তিগত বিকাশ উৎপাদন খণ্ড খণ্ড করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করলো। যেভাবে এই কাজগুলো হয়েছে তাতে প্রান্তস্থ দেশগুলোর উন্নয়ন হয়েছে বৈপরীত্য আর অসঙ্গতিতে ভরা। অন্যদিকে এই একইকারণে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনে ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট তুলনামূলকভাবে কমে কেন্দ্র দেশগুলোতে স্থিতিশীল কাজের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। বেকারত্ব বেড়েছে, কাজের ধরনগুলো হয়েছে অনিশ্চিত। বেড়েছে খণ্ডকালীন চুক্তিভিত্তিক ভাসমান কাজ। এভাবে পুঁজিবাদের ভেতরে স্থিতিশীল কর্মসংস্থানের সংকট বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্র প্রান্ত সর্বত্র বেড়েছে। বারবার অতি উৎপাদন ও মুনাফার ক্রমাবনতির সংকট দেখা দেওয়ায় মাঝে মধ্যেই লেঅফ, মার্জার আর

শ্রমিক ছাঁটাই চলেছে। (মুহাম্মদ, ২০১০)

কেন্দ্র দেশগুলোতে তুলনামূলক কম মজুরির কাজে অভিবাসীদের অংশগ্রহণ বেশি, যাদের মধ্যে বাংলাদেশিদের অনুপাতও ক্রমেই বাড়ছে। কর্মসংস্থানের সংকটে জর্জরিত পুরনো নাগরিকদের কাছে এই অভিবাসীদের ভয়ংকর প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা খুবই সহজ। চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির জন্য এই পরিস্থিতি খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। কর্মসংস্থানের সংকট থাকলেই যে মানুষ সব সাম্প্রদায়িক আর অভিবাসী বিদ্বেষী হয়ে যাবে তাতো না। কিন্তু যদি আতংক ছড়ানো যায়, যদি মিডিয়া, চলচ্চিত্র দখল করা যায়, যদি সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে অভিবাসীর আগমনকে যুক্ত করা যায় তাহলে সমাজে তার প্রভাব পড়বেই। ট্রাম্প গোষ্ঠীর সামাজিক ভিত্তি এভাবেই নির্মিত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত শিল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বৈষম্য হ্রাস দেখা গেলেও, ৮০ দশক থেকে এই বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। অক্সফামের বিশ্ব রিপোর্ট (২০১৯) এ বৈষম্য বৃদ্ধির এক ভয়াবহ চিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। টমাস পিকেটি তাঁর সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, '১৯৭৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সবচাইতে ধনী শতকরা ১০ ভাগ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তিন চতুর্থাংশ গ্রাস করেছে। সর্বোচ্চ ধনী শতকরা ১ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় মোট বৃদ্ধির শতকরা ৬০ ভাগ হজম করেছে।' তিনি আরও দেখিয়েছেন গত একশো বছরে শতকরা ১ ভাগের আয় দ্বিগুণ হয়েছে দুবার, প্রথমবার ১৯২৮ সালে, দ্বিতীয়টি ২০০৭ সালে। দুটোই অর্থনৈতিক মহাসংকটের আগে আগে। (পিকেটি, ২০১৪; ২৯৭) বৃহৎ অর্থকরী বিনিয়োগ কোম্পানির প্রধানদের আয় অর্থনৈতিক ধ্বসের আগে বছরে ১৫ লক্ষ ডলারের বেশি হয়েছিল। (ঐ; ৩০২) সকল তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কর স্বর্গগুলোতে পাচার করা অর্থের তিন চতুর্থাংশ এসেছে ধনী দেশগুলো থেকে। (ঐ; ৪৬৭)

পার্থ চ্যাটার্জি ধারণা করেছেন, পুঁজিবাদের নিরাপত্তা জাল কর্মসূচি, এমনকি ক্ষুদ্রঋণ পুঁজিবাদের আদি মূলধন সংবর্ধনের নৃশংসতার বিপরীত যাত্রা দেখায়। (চ্যাটার্জি, ২০১৫) এটা ঠিকই যে, সামরিক ব্যবস্থার মতোই এসব নিরাপত্তা ব্যবস্থাও একটা রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে, পুঁজিবাদের মুখে একটা মুখোশ পড়ায়। কিন্তু এটা খুবই ভুল ধারণা যে, এটি একটি বিপরীত যাত্রা কিংবা এটি পুঁজিবাদ স্বেচ্ছায় একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে । জেমস পেট্রাস সঠিকভাবেই দেখিয়েছেন যে, নিরাপত্তা জাল কিংবা কল্যাণমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাইরে থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ভেতর থেকে জনআন্দোলনের চাপে। ইউরোপে কল্যাণমূলক ব্যবস্থার বিকাশ এই পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটেছে। আবার যখন সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ভেঙে পড়েছে, জনপন্থী লড়াইও নানাভাবে দুর্বল তখন এসব কর্মসূচিও কাটছাট করবার আয়োজন চলছে। (পেট্রাস, ২০১২)

বিশ্বজুড়ে কাজ ও মজুরির নিরাপত্তা নিয়ে লড়াই-এর শক্তি ও সংগঠনও এখন দুর্বল হয়ে গেছে। ৮০ দশক থেকে পশ্চিমা বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়নগুলোও ক্ষয়ের শিকার হয়। ১৯৫০ সালে যেখানে মোট কর্মশক্তির শতকরা ৩০ ভাগ ট্রেড ইউনিয়নে যুক্ত ছিল সেখানে ২০১২ সালে তা শতকরা ১১ তে নেমে এসেছে। বেসরকারি খাতের শতকরা ৯১ ভাগের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ভাঙন, সামাজিক অধিকারের আন্দোলনে দুর্বলতার ফলে সৃষ্ট পুঁজির একচেটিয়া ক্ষমতার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলা সম্ভব হয়। অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, খণ্ডকালীন কাজই হয়ে দাঁড়ায় মূলধারা। (মুহাম্মদ, ২০১৯ক)

পুঁজিবাদের বিভিন্ন মুখ

> 'সেসময় আমরা বলেছি, একমাত্র পুঁজিবাদই চীনকে বাঁচাতে পারে, এখন আমাদের বলতে হবে একমাত্র চীনই পুঁজিবাদকে বাঁচাতে পারে।'–ইকনমিস্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী জনপন্থী সামাজিক অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচিতে হাত দিতে হয়। অন্যদিকে পুঁজিবাদী কেন্দ্র ও প্রান্তের দেশগুলোর শাসকেরা উত্তরোত্তর সোভিয়েত প্রভাব এবং সমাজতন্ত্রী শক্তিসমূহের বিকাশের মুখে একইসাথে দুটো কাজে মনোযোগ দেয় ; এর একটি হলো বামপন্থী বিপ্লবী শক্তি দমন, আর অন্যটি হলো পাল্টা কল্যাণমূলক কিছু কর্মসূচি। দুটোই একই কৌশলের দুই মুখ।

পুঁজিবাদ অনেকগুলো মডেলের মধ্যে দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। সমাজতন্ত্রেরও অনেকগুলো মডেল আমরা দেখেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বস্তুত ইউরোপেরই সম্প্রসারণ, এর ফলে পুঁজিবাদ বিকাশে সেখানে ইউরোপীয় ধারাবাহিকতা যেরকম আছে, ভেঙে দেখলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী চেহারার নানাবিধ পার্থক্যও আছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হচ্ছে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যেসব অর্থনীতি উন্নত শিল্পায়িত বলে পরিচিত, সেগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যখাতের অবস্থা সবচেয়ে দীনহীন। ব্যবস্থাটাই এমন সেখানে বীমা কোম্পানি, ডাক্তার, দালালসহ বহু মধ্যস্বত্বভোগী এই অর্থের ভাগীদার হিসেবে রাজত্ব করে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় বিপুল অর্থব্যয় হলেও জনগণ তার কোন সুবিধা পায় না। তুলনায় অনেক কম খরচ করে কানাডা ও ইউরোপীয় কয়েকটি দেশ এর থেকে ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে পাবলিক হেলথ সিস্টেম গড়ে তোলার কারণে।

বর্তমান চীনকে পুঁজিবাদেরই নতুন আরেকটি মডেল বলা যায়, যে দেশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে এখন রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের শক্তিশালী মডেল হিসেবে হাজির। ২০০৮ এর বিশ্ব অর্থনৈতিক ধসের সময় ইকোনমিস্ট পত্রিকায় লিখেছিল, '১৯৭৮ এ যখন দেং জিয়াও পিং সংস্কার শুরু করেছেন, সেসময় আমরা বলেছি, ওনলি ক্যাপিটালিজম ক্যান সেভ চায়না (একমাত্র পুঁজিবাদই চীনকে বাঁচাতে পারে) এখন আমাদের হয়তো বলতে হবে ওনলি চায়না ক্যান সেভ ক্যাপিটালিজম (একমাত্র চীনই পুঁজিবাদকে বাঁচাতে পারে)'। প্রকৃতপক্ষে এখন চীনের প্রবৃদ্ধির উপর পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অনেক কিছু নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির নিরাপত্তাও অনেকখানি চীনের উপর নির্ভরশীল। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের দুই ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের বন্ড এখন চীনের হাতে। চীন এখন এগুলো ছেড়ে দিলে ডলার আর দাঁড়াতে পারবে না। আবার ডলারের দাম খুব পড়ে গেলে চীনেরও সমস্যা।

বর্তমানে চীন পৃথিবীর বৃহত্তম বাজার এবং বৃহত্তম রফতানিকারক। মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ সত্ত্বেও চীন কতটা উৎপাদন করবে, কতটা কিনবে, কতটা বিক্রি করবে, কোথায় বিনিয়োগ করবে, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এমনকি বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কী অবস্থান নিচ্ছে তার উপর পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে চীনের বিনিয়োগ এখন অনেক বেড়েছে। আফ্রিকায় চীনের বিনিয়োগ ও 'বিদেশি সাহায্য' এখন পশ্চিমা দেশ ও সংস্থাগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। ল্যাটিন আমেরিকার সাথেও চীনের সম্পর্ক বেশি বেশি ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিতেও চীন এখন নেতৃত্বের সারিতে। চীনের কর্তৃত্বাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের আগ্রাসী ভূমিকা ও 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' কর্মসূচি অনেক কিছুই পাল্টে দিচ্ছে। তবে

বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক শক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখনও প্রায় নিরঙ্কুশ।

পুঁজির বর্তমান বিশ্বযাত্রায় উদীয়মান শক্তি ভারত। ৯০ দশকের গোড়ায় উদারনৈতিক বলে পরিচিত কংগ্রেসের অধীনেই নব্য উদারনৈতিক বা কট্টর পুঁজিপন্থী সংস্কার শুরু করে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে উঠা বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয় অর্থনীতি। তাদের পক্ষে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও নগ্ন করে তোলায় তাদের সবচাইতে বেশি আস্থা দেয় হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি। পাশাপাশি সমাজের ভেতরে বাড়তে থাকা সাম্প্রদায়িক বর্ণবাদী সংস্কৃতি বিস্তৃত হতে থাকে। এরই ফলাফল বিপুল পুঁজিসমর্থন ও জনসমর্থন নিয়ে বিজেপির ক্ষমতায় আরোহণ। শক্তিশালী নেতা হিসেবে নন্দিত হন গুজরাট গণহত্যায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী হিসেবে অভিযুক্ত নরেন্দ্র মোদী। বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সমর্থন আর তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার ওপর ভর করে তার পুঁজিপন্থী যাত্রা চলছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি-রাজনীতির গতিমুখ নির্ধারণে ভারতের ভূমিকা, রাজনীতি এবং অর্থনীতির গতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারক। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকলেও বাংলাদেশে ভারতের পণ্য আমদানি, নিয়োগ ও বিনিয়োগ দ্রুত বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম প্রবাসী আয়ের উৎস। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতের ট্রানজিটের মধ্য দিয়ে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক অর্থনৈতিক মানচিত্রও পরিবর্তিত হবার পথে। ভারতে দেশি বৃহৎ পুঁজি, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজি ও বহুজাতিক পুঁজির যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে তার সংবর্ধন, পুঞ্জীভবন এবং সম্প্রসারণের অনেক বেশি চাপ। বাংলাদেশ তার সুবিধাজনক গন্তব্য। চীনের জন্যও বাংলাদেশের বর্তমান প্রাণ প্রকৃতি বিনাশী উন্নয়ন মডেল খুব সুবিধাজনক। বাংলাদেশে এখন পুঁজির আদি সংবর্ধনের এক মডেলে পরিণত হয়েছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি চীন ও ভারত অন্যতম সহযোগী, রাশিয়ার তৎপরতাও ক্রমে দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে। (মুহাম্মদ, ২০১৫)

পুঁজির বিশ্বযাত্রার গতিমুখ : চার সম্ভাবনা

এই লেখার শুরুতে পুঁজিবাদের সূচনাকালে মার্কস-এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ইশতেহারের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এই ইশতেহারের পর মার্কস আজীবন পুঁজির বিকাশ ধারা বিশ্লেষণ করেছেন। বিভিন্ন লেখায় দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের আগ্রাসী শক্তির রূপ, দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের জীবন, তার জগত, প্রাণ প্রকৃতি, এমনকি তার মেধা, মনন, শরীর পুঁজি দখল করে, নিজের মতো করে মুচড়িয়ে নেয় বাজার উপযোগী করতে। দাসত্ব, শৃঙ্খলকে মোহময় চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে, মুনাফার দামামায় মানুষ হয়ে পড়ে তুচ্ছ। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মানুষ থেকে। মানবিকতা, সামষ্টিক বোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের শক্তির সাথে তার ভেতরে নতুন সম্ভাবনার বিকাশ সূত্র। (মুহাম্মদ, ২০১৯ক)

পুঁজিবাদের গতি ও প্রকৃতি বিষয়ে লেনিন, রোজা, হবসনসহ আরও পরের বিভিন্ন তাত্ত্বিকের বক্তব্যও এর আগে উপস্থিত করেছি। পুঁজিবাদের বিকাশ ধারা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, পুঁজিবাদ কীভাবে, উঠানামার মধ্য দিয়ে, সংকট এবং সংকট উত্তরণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে ক্রমে অধিক থেকে অধিকতর হারে একদিকে আন্তর্জাতিকীকৃত এবং অন্যদিকে একচেটিয়াকৃত হয়েছে। পুঁজির বিশ্বযাত্রার সাথে সাথে অভূতপূর্ব মাত্রায় পরিবেশ বিপর্যয় বিশ্বজুড়ে অধিপতি রাজনীতি ও উন্নয়ন চিন্তাকে বড় ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি করছে। (ক্লেইন, ২০১৪)

মনে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সংকট মানে তার বিকাশ রুদ্ধ হওয়া নয়; এই সংকট কখনো মূলধন সংবর্ধন প্রক্রিয়া এবং আত্মসম্প্রসারণকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ করে দেয় না। সংকট থেকে উত্তরণের চেষ্টার জন্য পুঁজিবাদের মধ্যেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অস্ত্র থাকে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল (১) ক্রমাগত প্রযুক্তিগত বিকাশ (২) বলপ্রয়োগ করতে গিয়ে সামরিক ও গোয়েন্দা তৎপরতার বিস্তার এবং (৩) মতাদর্শিক আধিপত্য, মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ। এই একচেটিয়া আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছে বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা। এই বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ক্রমে গৌণ হয়ে আবির্ভূত হয়েছে বৈশ্বিক কিছু প্রতিষ্ঠান : বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং তার সাথে জি-৭ ভুক্ত দেশের আমলাতন্ত্র। জাতিসংঘের বৈশ্বিক কাঠামো, পেন্টাগন সিআইএ ও ন্যাটোর সামরিক জাল এর সহযোগী।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার এই রাজনৈতিক অবয়বটি গত কয়েক দশকে বিকশিত হয়েছে। বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদী মতাদর্শিক আধিপত্য নির্মাণে এই অবয়বটি তার অধীনস্ত বিভিন্ন তথ্য মাধ্যম, 'সিভিল সোসাইটি', গবেষণা সংস্থা দিয়ে যেভাবে সক্রিয় সেটাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখার বিষয়। পুঁজিবাদ/সাম্রাজ্যবাদ এখন যতটা রাষ্ট্রীয় তার থেকে অনেক বেশি আন্তর্জাতিক। দেশে দেশে শাসক শ্রেণীও এখন তাই পুরোপুরি দেশীয় নয়। ট্রান্সন্যাশনাল পুঁজিপতি শ্রেণী একটি বাস্তব চরিত্র, এদের বিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠছে ট্রান্সন্যাশনাল শ্রমিক শ্রেণী, অভিবাসী শ্রমিক যার একটি রূপ। সেকারণেই শ্রেণী, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতিগত নিপীড়ন বিরোধী লড়াই এখন একইসঙ্গে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক।

পুঁজির বিশ্বযাত্রা এবং তার ভেতরের অস্থিরতা থেকে সামনের দিনের জন্য চারটি সম্ভাবনা সনাক্ত করা যায়। এগুলো হল : (১) পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্র পরিবর্তন, (২) নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের উদ্ভব, (৩) ফ্যাসিবাদের বিকাশ এবং (৪) বিপ্লবী বিকল্পের শক্তিবৃদ্ধি।

কেন্দ্র পরিবর্তন কিংবা বহু কেন্দ্র তৈরি হওয়া কিংবা বৈশ্বিক পুঁজির প্রতিনিধি হিসেবে বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেদের রক্ষার আরেকটি উপায় অধিকতর নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের দিকে যাত্রা। এমনিতে সন্ত্রাস দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীতে একটা ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে অধিকতর সক্রিয়, এই ব্যবস্থার বিকাশ সেই দেশের ভেতরেও তৈরি হয়েছে একটা ফ্যাসিবাদী আবহ। বিভিন্ন দেশে মাত্রাভেদে রাষ্ট্রের প্রকৃতি একই ধরন নিচ্ছে। বাংলাদেশেও পরিস্থিতি ভিন্ন নয়। পুঁজির স্বার্থে অধিকতর নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা রাষ্ট্রকে অধিকতর স্বৈরতন্ত্রী পথেই নিয়ে যেতে বাধ্য।

তবে যতোই সংকটে পতিত হোক পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পতন স্বয়ংক্রিয় ভাবে হবে না, তা নির্ভর করবে মানুষের সংগঠিত সচেতন ভূমিকার ওপর। এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব অধিকতর যুদ্ধ, ধ্বংস, দখলদারিত্বের দিকে যাবে; পরিবেশ দূষণ ভয়ংকর আকার নেবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনকে আরও নিরাপত্তাহীন করে তুলবে। শ্রেণী নির্যাতন ও বৈষম্য ছাড়াও জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গীয় বৈষম্য নিপীড়ন নতুন নতুন সংঘাত সহিংসতা ও নিষ্পেষণ তৈরি করবে। প্রকৃতি বিনাশের মধ্য দিয়ে তারা গোটা পৃথিবীর মানবজাতির অস্তিত্বকেই অসম্ভব করে তুলবে।

তবে যে প্রযুক্তিগত বিকাশ ভৌগোলিক দূরত্বকে অপ্রাসঙ্গিক করে পুঁজির বৈশ্বিক বিস্তারকে বেগবান করেছে তা একই সঙ্গে বৈশ্বিক প্রতিরোধ ও মুক্ত সমাজ নিয়ে মানুষের চিন্তার আদান-প্রদানকেও সহজ করেছে। একদিকে যেমন পুঁজির আগ্রাসন বেড়েছে, বৈষম্য বেড়েছে, জাতি ধর্ম বর্ণ বিদ্বেষ বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনি এসবের বিরুদ্ধে

লড়াইও নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। পাঠ, চিন্তা, তত্ত্বচর্চা, সংগঠন, রাজনৈতিক সংস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। দেশে দেশে শ্রেণীর পাশাপাশি লিঙ্গ, প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ, যুদ্ধ-সন্ত্রাস বিরোধিতা, অভিবাসী অধিকার এখন দুনিয়া পরিবর্তনকামীদের বিপ্লবী তৎপরতার কেন্দ্রে। বৃহৎ স্বপ্ন দেখার সক্ষমতা আর তার বাস্তবায়নের জন্য মানুষের সামষ্টিক উদ্যোগই পুঁজির বিশ্বযাত্রার বিপরীতে শৃঙ্খলিত মানুষ ও বিপর্যস্ত প্রাণ প্রকৃতিকে মুক্ত করার যাত্রাকে শক্তি দান করতে পারে।

[এই প্রবন্ধের আগের সংস্করণ গত ২৫ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের আয়োজনে 'নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতা' হিসেবে পঠিত হয়েছিল। অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম (১৯২২-১৯৮২) বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান চর্চায় পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ১৯৫৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, যার পথ ধরে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে। ডক্টর করিম আজীবন নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন, সেইসঙ্গে সমাজবিজ্ঞান গবেষণা ও প্রকাশনাতেও তিনি ছিলেন অগ্রণী।]

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anu@juniv.edu

নির্দেশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

আমিন ২০১০। Samir Amin, *The Law of Worldwide Value* (New York: Monthly Review, 2010).

ওয়ালারস্টেইন ২০০০। Wallerstein, I. 2000. 'Globalization or the age of transition?' International Sociology, 15 (2).

ক্লেইন ২০০৭। Naomi Klein: *Shock Doctrine: The Rise of the Disaster Capitalism?* Metropolitan Books, New York, 2007

ক্লেইন ২০১৪। Naomi Klein: *This Changes Everything. Capitalism vs the Climate,* NY, 2014

ক্লেয়ার ২০০০। Sklair, L: *The Transnational Capitalist Class.* London: Blackwell, 2000.

ক্যাস্টেল ১৯৯৬। Castells, M: *The Rise of the Network Society.* Vol. I of The Information Age: Economy, Society, Culture. Oxford: Blackwell, 1996.

গিডেন্স ১৯৯০। Giddens, A: *The Consequences of Modernity.* Cambridge: Polity Press, 1990.

চ্যাটার্জি ২০০৭। Partha Chatterjee, Forward in Kalyan Sanyal: *Rethinking Capitalist Development, Primitive Accumulation, Governmentality & Post-Colonial Capitalism,* Routledge, New Delhi, 2007.

পিকেটি ২০১৪। Thomas Piketty: *Capital in the Twenty-First Century,* Harvard University Press, 2014.

পেট্রাস, ২০১২। James Petras: "The Great Transformation: From the Welfare State to the Imperial Police State", http://petras.lahaine.org/?p=1903, 2012

ফস্টার এবং ম্যাকেনসি ২০১৪। John Bellamy Foster and Robert W. McChesney: "Surveillance Capitalism- Monopoly-Finance Capital, the Military-Industrial Complex, and the Digital Age", Monthly Review, Jul 01, 2014

ফেকেটে ২০১৬। Liz Fekete: 'Neoliberalism and Popular Racism: The Shifting Shape of the European Right;, Socialist Register 2016.

মার্কস ও এঙ্গেলস ১৯৭৭। Karl Marx and Frederick Engels: *Manifesto of the Communist Party,* PRC, 1977.

মার্কস, ১৯৬৯। Marx, *Capital,* Vol. 3, Progress Publishers, Moscow, 1969.

ম্যান্ডেল ১৯৭৬। Earnest Mandel : *Late Capitalism,* Zed, 1976.

মুহাম্মদ, ১৯৯৩। আনু মুহাম্মদ: *পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাবি।

মুহাম্মদ, ২০০৩। আনু মুহাম্মদ: *বিশ্বায়নের বৈপরীত্য*, শ্রাবণ, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ২০১০। আনু মুহাম্মদ: *পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা*, সংহতি, ঢাকা।

মুহাম্মদ ২০১৫। Anu Muhammad: "Bangladesh: A model of Neo-Liberalism", Monthly Review, March, 2015.

মুহাম্মদ, ২০১৯। আনু মুহাম্মদ: প্রাণ প্রকৃতি বাংলাদেশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ২০১৯ক। আনু মুহাম্মদ: অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র: সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা, সংহতি (২য় সংস্করণ), ঢাকা।

যুবফ ২০১৫। Zuboff, Shoshana. "Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization". *Journal of Information Technology*. 30 (1): 75–89. PDF file online. April 2015.

রেজিস্টার, ২০১৫। Socialist Register 2016. Ed by Leo Panitch and Greg Albo, Merlin Press.

হার্ট এবং নেগরি ২০০০। Hardt, M. and Negri, A: *Empire*. Cambridge, Harvard University Press, 2000.

হার্ভে ২০১১। David Harvey, *The Enigma of Capital and Crises of Capitalism* (Profile Books, 2011).

হান্ট ১৯৭৯। E K Hunt: *History of Economic Thought- A Critical Perspective*, Wedsworth, USA.

রিটজার ১৯৯৩। Ritzer, G: *The McDonaldization of Society.* London: Sage, 1993.

রবিনসন ২০০৪। Robinson, W.I: *A Theory of Global Capitalism: Production, Class and State in a Transnational World.* The Johns Hopkins University Press, 2004.

লওয়ি এবং সিটেল ২০১৬। Michael Lowy and Francis Sitel: 'The Far Right in France: The Front National in European Perspective', Socialist Register 2016.

লেনিন, ১৯৭৭। V I Lenin: *Collected Works*, Vol. 22, Progress Publishers, Moscow, 1977.

লুক্সেমবুর্গ ২০০৩। Rosa Luxemburg: *The Accumulation of Capital*, Routledge Classics edition, 2003.

সুইজি, ১৯৯৭। Paul M. Sweezy, "More (or Less) on Globalization," Monthly Review 49, no. 4, September, 1997.